শতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি গান এবং কিছু বিতর্ক

রঙ্গনকান্তি জানা

২০১১ ইংরেজি সাল, শিক্ষিত বাঙালি-মানসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সাল। এই বছরটিতে বেশ কয়েকজন বাঙালি ব্যক্তিত্বের জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালন করা হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই বিশিষ্টজনদের বাদ দিলে বহু বাঙালির সার্ধশতবর্ষ এই আলোচ্য বছরটি। আসলে যাঁদেরকে নিয়ে আজ শিক্ষিত বাঙালি বেশি মাতোয়ারা বাঙালি জনমানসে তাঁদের কৃতকর্মের কিছু না কিছু প্রভাব আজও বজায় আছে। এই বছরটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁদের জন্মের পর দেড়শত বছর পূর্ণ করলেন। এঁদের সকলেই ঐতিহাসিক মানুষ। বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি-বিদ্যাচর্চার স্বস্ব ক্ষেত্রে জীবৎকালে যথেষ্ট অবদান রেখে গিয়েছেন।

এই আলোচনা কোনও ব্যক্তিমানুষকে নিয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি গান নিয়ে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তার অনেকগুলি গানই তো তার শতবর্ষ -অতিক্রান্ত, হঠাৎ একটি গানকে কেন এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আলোচ্য গানটি আমাদের স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত। গানটি হল—''জনগণমন অধিনায়ক জয় হে''। গানটির রচনাকাল বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায়, অঙ্কের হিসাব অনুযায়ী ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।

মূল আলোচনায় যাবার আগে একথা স্মরণ রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বিশ্বের একমাত্র কবি, যাঁর দুটি গান দুটি স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত। একটি আগেই বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গড়ে ওঠা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। গানটি হল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

আজ যেটি আমাদের জাতীয় সংগীত হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য ও বিবেচিত— তার জাতীয় সংগীত হয়ে ওঠার যাত্রাপথটি সহজ সরল ছিল মনে করা সংগত হবে না। বেশ কিছু বাধা অতিক্রম করে, অনেক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানটি। গানটি লেখা হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের খুব সম্ভবত ডিসেম্বর মাসে। গানটি প্রথম গাওয়া হয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (২৬তম)। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর এই গানটি উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গানটি পরিবেশন করেন অমল হোম, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত প্রমুখ। ওই একই অধিবেশনে দ্বিতীয় যে গানটি গাওয়া হয় সেটি হল— হিন্দি ভাষায় রামভুজ দত্তচৌধুরীর লেখা : ''মেরা পাদ শাহ''। দ্বিতীয় গানটির রচনাকার সরলাদেবী চৌধুরানীর স্বামী, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি -জামাই, কারণ সরলাদেবী রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা।

এই ঘটনার উল্লেখ করে ২৮ ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের কলকাতার বেশ কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে লেখা হয়। ইংরেজ মালিকানার সংবাদপত্র 'দ্য ইংলিশম্যান' পত্রিকায় লেখা হয়—

> The Proceeding opend with a song of welcome to the King Emperor, specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore...This was followed by another song in Hindi welcoming Their Imperial Majesties. The coir in both songs was led by Mrs Rambhuj Dutt Chaudhuri. [The Englishman, 28.12.1911]

অপর ইংরেজ মালিকানার সংবাদপত্র 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় লেখা হয়—

> The Proceedings commenced shortly before 12 O'clock with a Bengali song...The coir of girls led by Sarala Devi (Mrs. Rambhuj Dutt Chaudhury) then song a hymn of welcome to the King sepcially composed for the occasion by babu Rabindranath Tagore, the Bengali poet. [The Statesman, 28.12.1911]

বাঙালি মালিকানার দুটি ইংরেজি কাগজ যথাক্রমে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়।

> The Proceedings began with the singing of a Bengali song of benediction...This was followed by another song in honour of Their Imperial Majesties 'visit of India. [The Amritabazar Patrika, 28.12.1911]

অন্যদিকে বেঙ্গলী পত্রিকায় লেখা হয়—

> The Proceedings Commenced with a patrioctic song composed by babu Rabindranath Tagore, the leading poet of Bengal ('Janaganamana-adhinayaka']. A hindi song paying heartfelt homage to Their Imperial Majesties was sung by the Bengali boy and girls in chorusl. [28.12.1911]

উপরি-উক্ত চারটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের পরিবেশিত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখলে বোঝা যায় এরকম নয়।

মূল আলোচনায় যাবার আগে, সেই সময়কার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চালচিত্রটা একবার দেখে নেওয়া

যেতে পাতে। বিংশ শতকের প্রথম দশক এবং দ্বিতীয় দশকটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ -এর জন্য ইংরেজ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সরকার দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের ২৬ তম অধিবেশন, ওই একই মাসের ৩০ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লির সংবর্ধনা গ্রহণ করে কলকাতা আগমন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে 'নাইটহুড' উপাধি প্রদান, যা তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যত এগিয়ে আসছিল, ততই বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে মধ্যপন্থী কংগ্রেসিদের প্রাধান্য ছিল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে চলে আসার পর এবং জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের পর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতীয় কংগ্রেসি রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত হয় গান্ধিজির কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মধ্যপন্থী কংগ্রেসিদের যোগাযোগ ভালোই ছিল। 'জনগণমন' গানটি ছাপার আকারে প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (মাঘ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। গানটির শিরোনাম দেওয়া হয় ভারতবিধাতা। তখন পত্রিকার সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'জনগণমন' গানটি ব্রহ্মসংগীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় মহর্ষিভবনে মাঘোৎসবে গাওয়া হয়। মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ প্রদান করেন সেই ভষণটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ধর্মের নবযুগ' নামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— 'জনগণমন' গানটির 'ভারত ভাগ্যবিধাতা'কে 'মানবভাগ্য বিধাতা' এই বাক্যে স্বয়ং কবির হাতেই পরিবর্তিত হয়। 'মানবভাগ্য বিধাতা' বাক্যের মধ্য দিয়ে একটা ঐশ্বরিক ভাবকে পাঠকের সামনে উত্থাপন করতে চান কবি।

এ পর্যন্ত যে তথ্য পরিবেশিত হল তার ভিত্তিতে উক্ত গানটির তিনটি ভাবকে অনুধাবন করা যায় যথাক্রমে দেশাত্মবোধক বন্দনা, রাজশক্তির বন্দনা এবং সর্বোপরি ঈশ্বর-বন্দনা। এরপর কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বত্রিশতম অধিবেশন বসেছিল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬, ২৭ এবং ২৮ ডিসেম্বর। এই অধিবেশনের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর 'জনগণমন' গানটি উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকা বা দ্য স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় গানটিকে দেশাত্মবোধক গান হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

> The Indian National Congress sat at 11.30 a.m., the proceedings commencing with an inspiring patriotic song of Rabindranath as usual in chorus...[The Amritabazar Patrika, 31.12.1911]
>
> The Congress chorus then chanted the magnificent song of Sir Rabindranath Tagore, Jana-Gana-Mana...[Bengalee, 30-12-1917]

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। মদনপল্লী-র 'থিওসফিক্যাল কলেজ'-এ এক সভায় 'জনগণমন' গানটি গাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ গানটির একটি ইংরেজি অনুবাদও করেন। 'The Morning Song of India' শিরোনামে গানটির বাণীতে মুগ্ধ হয়ে এই কলেজ গানটিকে তাদের প্রাত্যহিক প্রার্থনা -সংগীত হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। গানটির মর্মস্পর্শী বাণী এই কলেজের অধ্যক্ষ জেমস কারিন্‌সকে নাড়া দেয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর 'The Madras Mail' পত্রিকায় এই আইরিশ কবির গানটির স্বপক্ষে যে মতটি প্রকাশিত করেন তা এই—

> My Suggestion is that Dr. Rabindranath's own intensely patriotic, ideally stimulating and at the same time world-embracing Morning Song of India (Jana-Gana-Mana) should be confirmed offcially as what it has for almost twenty years been unofficially, namely, the true National Anthem of India.

বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের প্রায় শেষ থেকে ভারতবর্ষের একটি জাতীয় সংগীতের প্রয়োজনীয়তা জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মনে হতে থাকে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সভা ২৮ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে এমন একটি গানকে নির্বাচন করা হোক, যেটির বিরুদ্ধে কোনও আলোচনা থাকবে না। এই কাজটি করার জন্য একটি সাব-কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়— যেখানে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ। যে গানটি সামনের সারিতে এসে দাঁড়ায় সেটি হল 'জনগণমন'। এই সময় 'জনগণমন' গানটিকে পঞ্চম জর্জ-এর প্রশস্তিতে রচিত বলে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। মনে রাখতে হবে, গানটি রচিত হয়েছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আনুমানিক ডিসেম্বর মাসে এবং বিতর্কের সূত্রপাত দীর্ঘ দু-দশকেরও বেশি সময় পার। এই বিতর্ক চলাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌনতাকে ভঙ্গ করে দুটি ব্যক্তিগত পত্রে এই গানটির রচনা প্রসঙ্গে কিছু মত ব্যক্ত করেন। প্রথম পত্রটি লেখেন পুলিনবিহারী সেনকে, ২০ নভেম্বর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে।

জনগণমন-অধিনায়ক গানটি কোনো উপলক্ষ্য-নিরপেক্ষভাবে আমি লিখেছি কিনা তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। বুঝতে পারছি এই গানটি নিয়ে দেশের কোনো কোনা মহলে যে দুর্বাক্যের উদ্ভব হয়েছে তারই প্রসঙ্গে প্রশ্নটি তোমার মনে জেগে উঠল।...তোমার চিঠির জবাব দিচ্ছি কলহের উষ্মা বাড়াবার জন্যে নয়, ঐ গান রচনা সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল মেটাবার জন্য।

একদিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিলিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা-মিশ্রিত স্তরের গান রচনা করার জন্য আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না; সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের অধিকারগত হত তা হলে আমার ধর্মবিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সংকোচের কারণ থাকত না; কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে, পূজার ক্ষেত্রে, অনধিকার প্রবেশ গর্হণীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন নি। আমি রচনা করেছিলুম 'ভুবনমনোমোহিনী', এ গান পূজামণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে এ গান সর্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিতভাবে মর্মঙ্গম হবে না।

আমার ভাগ্যে অনুরূপ ঘটনা আর-একবার ঘটেছে। যে বৎসর ভারত-সম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারের প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন-অধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয়ঘোষণা করেছি, পতন-অভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক—সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন। কেননা তাঁর ভক্তি যতই প্রবল থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না। আজ মতভেদবশত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ভাবটা দুশ্চিনাতর বিষয় নয়, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশটা দুর্লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে আর-এক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে, সে বহুদিন পূর্বের কথা, তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল রাজপ্রাসাদের দুর্গম উচ্চ শিখর থেকে প্রসাদকর্ণাবর্ষণের প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েকজনের সান্ধ্য বৈঠক বসবার কথা ছিল। তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। যেতে হল। ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেছিলাম— 'আমায় বোলো না গাহিতে' ইত্যাদি। এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হন নি।

তারও প্রায় দু-বছর পর জনৈকা সুধারানী সেনকে চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২৯ মার্চ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে লেখেন— তুমি যে প্রশ্ন করেছ এ রকম অদ্ভুত প্রশ্ন পূর্বেও শুনেছি।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা/ যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি তব রথচক্রে/ মুখরিত পথ দিনরাত্রি—

শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি ব'লে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্থে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।

সুধারানী সেন-এর চিঠিটির হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি, যার থেকে চিঠিটিতে প্রকৃত কী জানতে চাওয়া হয়েছিল, তা অন্ধকারে থেকে গিয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জবাবি উত্তরে এটা স্পষ্ট, আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বেশ মরিয়া ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ মধ্যপন্থী কংগ্রেসি রাজনীতির সান্নিধ্যে থেকে ব্রিটিশ কৃপার জন্য লালায়িত হননি তো? —এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে। এর পাশাপাশি এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি জন্মেছিলেন সিপাহি বিদ্রোহের চার বছর পর। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ শুধুমাত্র ইংরেজ ঔপনিবেশিক ভারতের পরাধীন মন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেছিল। তবে শিক্ষিত বাঙালির পরাধীন মন ছিল এই আন্দোলনের সর্বাগ্রে। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ এই কাজে ছিলেন অগ্রদূতস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ বাল্য-কৈশোর-যৌবন পরিবারের অন্দরমহলে থেকেও বহির্জগতে পরাধীন বাঙালি মনকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে দেখেছেন এবং তাঁর পরিবারের ভূমিকাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালির আন্দোলনে তিনি যেমন অংশগ্রহণ করেছেন, তেমনি দিয়েছিলেন নেতৃত্ব। ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্পর্কিত তাঁর প্রথম রচনা 'ঝান্সীর রানী'। এটি একটি প্রবন্ধ, প্রকাশিত হয়েছিল ভারতী পত্রিকায় ১২৮৪

বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা (১৮৭৭ খ্রি.)। সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে এটিই বাংলা ভাষায় প্রথম রচনা। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সুরেই বলেছেন, ''ভারতবর্ষের কি দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করিতে হয়।''

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা বৌ-ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। প্রতাপাদিত্যের চরিত্র-চিত্রণে তিনি নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকেই অনুসরণ করেছিলেন। যে পরিবারের তিনি সন্তান, যেখানে সিপাহি বিদ্রোহের পর স্বাদেশিকতার ঢেউ উঠেছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মেলা সংগঠনে ঠাকুর পরিবারের ভূমিকাটিও স্মরণযোগ্য। সেই পরিবারের উত্তরসূরি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেশপ্রীতি ছিল, তবে ছিল না কোনও উন্মাদনা। তাঁর উপন্যাসে 'প্রতাপ' চরিত্রটি দেশাভিমানবর্জিত রূপে চিত্রিত। 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' ঘিরে যে উন্মাদনা কলকাতাতে দেখা দিয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ -সরলাদেবীর সম্পর্কে সংকট তৈরি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে ভারত ইতিহাসের অনুসন্ধান দুটি পর্বে ভাগ করা যায়— এক, ঊনবিংশ শতকের শেষের দশকগুলিতে তথ্যভিত্তিক ইতিহাসাশ্রয়ী কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ জাতীয় জাগরণের লক্ষ্য নিয়ে রচনা; দুই, বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে গৌরবগাথা রচনার পথ থেকে সরে গিয়ে অখণ্ডবোধ, সামাজিক ইতিহাসে প্রাধান্য, সমাজতত্ত্বের আলোকে ইতিহাস রচনার চেষ্টা, মিলনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করতে থাকেন। 'জনগণমন' গানটি তারই অনুসরণ, কোনোভাবেই রাজ- প্রশস্তিমূলক গান এটি ছিল না। তবে দেশাত্মবোধ এবং সর্বশক্তিমান বিশ্বেশ্বরের প্রতি আনুগত্য অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চম জর্জের ভারত-আগমন বা কলকাতা আগমন এবং বিরুদ্ধবাদীদের এ-বিষয়ে মনগড়া একটি গল্পকে খাড়া করা নিতান্তই একটি কাকতালীয় ব্যাপার বলে বোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। একজন পরাধীন দেশের কবির বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে এহেন স্বীকৃতি, তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তির কোনও উচ্ছ্বাসের কারণ হয়নি। কোনও অভিনন্দন বার্তাও কবিকে প্রেরণ করা হয়নি। তাঁর রাজশক্তি 'নাটউহুড' দিয়ে সম্মানিত করেন ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ নভেম্বর। এর পেছনে একটা কারণ হয়তো তিনি, তা হল তখন প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্নপ্রায়, রাজশক্তি তার পরাধীন প্রজাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে প্রয়াসী। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন—প্রথম ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি হলেন রুডিয়ার্ড কিপলিং। তাঁকে নিয়ে ইংল্যান্ডে বেশ মাতামাতি অবশ্যই হয়েছিল। পুরস্কারপ্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথকে 'রয়েল সোসাইটি অব লিটারেচার' এবং বিখ্যাত 'ব্রিটিশ আকাদেমির' কোনও সম্মান প্রদর্শন করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক 'ডক্টর অব লিটরেচার' সম্মানে ভূষিত করে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ-কে তিনবার 'অর্ডার অব মেরিট' 'সম্মানে ভূষিত করতে রাজশক্তি চেষ্টা করলেও, তিনি তিনবারই তা অগ্রাহ্য করেন। যে 'নাটকহুড' তাঁকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রদান করা হয়, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা ও রাজশক্তির নিষ্ঠুরতম ব্যাপারের প্রতিবাদে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তা পরিতাগ করেন। যার থেকে মনে করা অসংগত হবে না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরাধীন ভারতবর্ষের একজন অধিবাসী এবং নোবেলজয়ী একজন কবি হয়েও রাজকৃপাপ্রার্থী ছিলেন না। 'The Historical Record of the impirial visit to India 1911' যেটি বাংলা ভাষায় তরজমা করেন দীনেশচন্দ্র সেন। 'সম্রাট ও সম্রাট মহিষীর ভারত পরিদর্শন' শীর্ষক পুস্তকাটিতেও কেথাও 'জনগনমণ' গানটি যে সম্রাটপ্রশস্তি সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও মন্তব্য কিন্তু নেই। এমনকী 'Narrative of the visti of India of Their Majesties king Georgv V and Queen Mary and of the Coronation durbar Held at Delhi (12 Decemberr 1911) এই বইটিতেও 'জনগণমন' গানটি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। এবং বইয়ের পরিশিষ্টে কলকাতার সম্প্রাট-আগমনের অনুষ্ঠানে বাঙালি অভ্যাগতদের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ নামটি কিন্তু অনুপস্থিত ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজে 'জনগণমন' গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় গাওয়া হত। সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে গানটির একটি হিন্দি অনুবাদ করেন জনৈক হুসেন নামে এক কবি। গানটি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধির হরিজন পত্রিকায় যে বক্তব্য প্রকাশ করেন, যা একটি প্রার্থনাসভায় তিনি গানটির স্বপক্ষে পেশ করেছিলেন, তা হল—

> ...They had just heard the national song he worte, a song which has found a place in our national life. How aften is the inspiring refrain heard from thusand of voices! It is not only a song but is also like a devotional hymn.

দেশের স্বাধীনতা অর্জন যখন প্রায় নিশ্চিত, দেশের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীতের জন্য প্রয়াস চালাতে থাকেন। সেই সময়ও দুটি গান সর্বাগ্রে থাকে— প্রথমটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম', দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে'। 'বন্দেমাতরম' গানটি সম্পর্কে মুসলিম নেতৃত্বের ধর্মীয় আপত্তি ছিল। দেশ স্বাধীনতালাভের পর নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি দিয়ে, জাতীয় সংগীত শোনাতে অনুরোধ করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে ব্যান্ডের সুরে ধরা 'জনগণমন' গানটির একটি রেকর্ড কর্তৃপক্ষের হাতে বাজানোর জন্য তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গানটি জাতীয় সংগীতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

২৫ আগস্ট ১৯৪৮ দিল্লির কন্‌সিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে যে বক্তব্য 'জনগণমন' জাতীয় সংগীতের স্বপক্ষে রেখেছিলেন, তার বিবৃতি ও বিবরণ ২৬ আগস্ট ১৯৪৮ ইংরেজি সংবাদপত্র Hindusthan Standard-এ ছাপা হয়।

গানটি জাতীয় সংগীতের স্বীকৃতি লাভ করে ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। এই গানটি সংবিধানে স্বাক্ষর গ্রহণের পর 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসাবে গাওয়া হয়। শ্রীমতী পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে গানটি পরিবেশন করেন। তবে তার আগেও গানটি গাওয়া হয় ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য রাত্রে, কন্‌সিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির অনুষ্ঠান শেষ করা হয় এই গানটি দিয়ে। স্বাধীনতালাভের প্রথম বর্ষ উদ্‌যাপনেও লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলনের সময় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর শিখ রেজিমেন্ট সেন্ট্রাল ব্যান্ড বাজিয়ে এই গানটি শোনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই গানটি পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত। ভারতের জাতীয় সংগীত শুধুমাত্র প্রথম স্তবকটি।

১

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুব নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয়, জয় হে।।

(প্রথম স্তবকটিতে : ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিসীমা, মানুষ, ধর্ম ও অঞ্চলবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুরটি ধরা রয়েছে)

২

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পুরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয়, জয় হে।।

(দ্বিতীয় স্তবকটিতে : ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যেও একসূত্রে ঐক্যের সুর দৃঢ়রূপে কথিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অটুট প্রেম বন্ধনের আহ্বান করা হয়েছে।)

৩

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগযুগধাবিত যাত্রী—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয়, জয় হে।।

(তৃতীয় স্তবকটিতে : যুগ যুগ ধরে মনুষ্য জাতির অগ্রগতি, তার পতন-অভ্যুদয়ে চির সারথি স্বয়ং ঈশ্বর।)

৪

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয়, জয় হে।।

(চতুর্থ স্তবকটিতে : ঈশ্বর মায়ের মতো সদা জাগ্রত থেকে জাতির সুরক্ষায় মগ্ন।)

৫

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।

তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয়, জয় হে।।

(পঞ্চম তথা শেষ স্তবকটিতে : নতুন প্রভাবে নবজাগ্রত ভারতবর্ষ নব কর্মপরিকল্পনাকে সুসম্পন্ন করতে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করবে।)

তথ্যসূত্র

১। John Murray, The Historical Record of the Imperial Visit to India, 1911, London, 1914.

২। John fortesque, Narrative of the visit to India of their Majesties King George V and Queen Mary and of the Corondation Durbar Held at Delhi 12 December 1911, MacMillan and Co., 1912

৩। দীনেশচন্দ্র সেন, সম্রাট ও সম্রাট মহিষীর ভারত-পরিদর্শন, কলকাতা (এস. কে. লাহিড়ী অ্যান্ড কোং) এপ্রিল, ১৯১৮।

৪। প্রবোধচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষের জাতীয়সঙ্গীত, পূর্ব্বাশা লি., কলকাতা, ১৯৪৯।

৫। Krishna Kripalani, Rabindranath Tagore: A Biography, Oxford University Press, London 1962.

৬। Rabindra Kumar Dasgupta, Our National Anthem, Calcutta, 1993.

৭। সুমিতা চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটি অভিযোগ', আমার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণে বর্জনে, কলকাতা, মার্চ ২০১০।

৮। রঙ্গনকান্তি জানা, 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা', সুমিতা চক্রবর্তী (স.) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও একুশ শতকের বাঙালি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ৯ মে, ২০১১।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, কলকাতা, ১৯৬০।

১০। সঙ্গীতচিন্তা, বিশ্বভারতী - কলকাতা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৬-৪৭।

জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি লেখকের দেখার সুযোগ হয়েছে।

ক। The Englishman, 28.12.1911

খ। The Statesman, 28.12.1911

গ। The Amritabzar Patrika, 28.12.1911

ঘ। Bengalee, 28.12.1911

ঙ। The Amritabazar Partika, 31.12.1971

চ। bengalee, 30.12.1917

ছ। Hindusthan Standard 26.08.1948

জ। Harijan, 19.05.1948

ঝ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
madras State Archives -এর সৌজন্যে

ঞ। The Madras Mail, 31.11.1937

(এছাড়া অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, বেশ কিছু তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। লেখক এজন্য কৃতজ্ঞ।)